দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজবংশী লোকগীতির পটভূমি এবং এই সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই প্রশ্ন আসতে পারে রাজবংশী কারা অথবা রাজবংশী জাতি কারা ? উত্তরবাংলার পাঁচটি জেলা যেমন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সকলেরই জীবনধারনের রীতি একই ছাঁচে ঢালা। উত্তরবঙ্গের নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গ আসাম ও সন্নিহিত অঞ্চল যেমন বিহারের কিয়দংশ তাছাড়া মেঘালয় এবং জয়পুরেও বেশ কিছু রাজবংশী পরিবার বসবাস করে। নেপালের ঝাপাতে, বাংলাদেশের রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলে রাজবংশীদের বাস আছে।

এই বিস্তৃত অঞ্চলে রাজবংশীর সংখ্যাই বেশি। মুসলমান রাজবংশীও রয়েছে। হিন্দু রাজবংশীর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা থেকে প্রায় তিনগুন। কোচ, মেচ, ধীমাল, খারু, ভুটিয়া, টোটো প্রভৃতি মানুষেরও বাস ছিল। ১৮৮১ সালের যে লোকগণনা হয় তখন শুধু কোচবিহারে লোকের সমষ্টি স্থির হয়েছিল ৬০০১৪৬। সেই সময় বিভিন্ন জাতির মানুষও বাস করত। শ্রী ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে ১৮৮১ সালের কুচবিহার জেলার লোকগনণার পরিসংখ্যান দেখিয়েছেন।[১]

থানার নাম	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
হলদিবাড়ি	১৮২৮২	১৬৯৭০	৩৫২৫২
মেখলীগঞ্জ	২৭২৮১	২৪৮১৪	৫২০৯৫
মাথাভাঙ্গা	৭১২৩০	৭৪০১২	১৫৩২৪২
দিনহাটা	৭৮৮৯৫	৭৬৫২৭	১৫৫৪২২
কোচবিহার	৭৩০১৫	৩৬১৬০	১৩৯১৭৫
তুফানগঞ্জ	৩৪০৮৬	৩১৬৭৪	৬৫৭৬০
	৩১০৭৮৯	২৯০১৫৭	৬০০১৪৬

এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির মানুষের সংখ্যা নিম্নরূপ :

হিন্দু	৪২৫৪৭৮
মুসলমান	১৭৪৫৩১
খ্রীষ্টান	৪৮
জৈন	১৪৪
সাঁওতাল	১১
আদিমজাতীয়	৩১৬
অন্যান্য	৩২২

শ্রী চারুচন্দ্র স্যান্যাল তাঁর The Rajbansis of North Bengal গ্রন্থে বলেছেন : "The Rajbansis are found throughout the undivided Bengal, Purnea in Behar and Goalpara in Assam."[2]

তিনি ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশীদের জনসংখ্যার একটা লোকগণনাভিত্তিক হিসেব দিয়েছেন :

১৮৭২	২১০, ৫৮৪
১৮৯১	৩০, ৫০৮
১৯০১	৯৩৯, ২৯১
১৯১১	১, ২১৮, ৩৪৬
১৯২১	১, ১৬৫, ১৪১
১৯৩১	১, ২০৯, ৬১২
১৯৪১	৮২৬, ৬৪০
১৯৫১	৭৪২, ৬১৯

নিম্নে ১৯৭১ সালের জেলাগুলির জনসংখ্যা এবং এর শতকরা হিসেব দেওয়া হল।" ৩

জেলা	মোট জনসংখ্যা	শতকরা
দার্জিলিং	৩১, ৫০৫	৩.০৬
জলপাইগুড়ি	৩, ২৯, ১৯১	৩২.০৩
কোচবিহার	৪, ৮১, ৩০৪	৪৬.৮৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১, ৩৬, ৯৭৫	৯৩.১৩
মালদহ	৫০, ৬৯৩	৪.৯৪
উত্তরবঙ্গ	১০, ২৭, ৬৬৯	

শ্রী রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর **The Rajbansis of North Bengal** গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চারশ্রেণীর মানুষের ১৯৫১-১৯৭১ সালের মোট জনসংখ্যার হিসেব দিয়েছেন।

জেলা	বছর	মোট জনসংখ্যা	তরাজবংশী	অন্যান্য অনুন্নত জাতি	রাজবংশী	উপজাতি
			(শতকরা)	(শতকরা)	(শতকরা)	(শতকর
দার্জিলিং	১৯৫১	৪৪৫, ২৬০	৮৪.২৫	২.২৯	৩.৫৭	৯.৮৯
	১৯৬১	৬২৪, ৬৪০	৭১.৩৭	৮.১৫	৫.০৪	১৫.৪৪
	১৯৭১	৭৪১, ৭৭৭	৭৩.৫৪	৮.৫৪	৪.০৩	১৩.৮৯
জলপাইগুড়ি	১৯৫১	২১৪, ৫৩৮	৫৩.৫৯	৬.৮৪	১৮.৮৮	২০.৬৯
	১৯৬১	১, ৩৫৯, ২৯২	৪৩.১০	৭.৫৫	২৩.২৫	২৬.১০
	১৯৭১	১, ৭৫০, ১৫৯	৪১.৪৯	১৫.২১	১৮.৮১	২৪.৪৯

জেলা	বছর	মোট জনসংখ্যা	আরাজবংশী	অন্যান্য অনুন্নত জাতি	রাজবংশী	উপজাতি
			(শতকরা)	(শতকরা)	(শতকরা)	(শতকরা)
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৫১	২৩৭, ৫৮০	৬৫.৬৮	৭.৭২	২.৩৭	১৭.২৩
	১৯৬১	১, ৩২৩, ৭২৭	৬৫.৫২	১৪.৫৮	৭.০৫	১২.৮৫
	১৯৭১	১, ৮৫২, ৮৮৭	৬৫.০০	১৫.৮৪	৭.২৬	১১.২০
কোচবিহার	১৯৫১	৬৭১, ১৫৮	৫৯.৪৬	২.৫২	৩৭.৫৬	০.৩২
	১৯৬১	১, ০১২, ৮০৬	৫২.২৩	৫.৩৫	৪১.০৬	০.৮৬
	১৯৭১	১, ৪১৪, ১৮৩	৫২.২২	১২.২২	৩৪.১৪	০.৭৫
মালদহ	১৯৫১	২৩৭, ৫৮০	৭৬.৮৭	১২.৩৮	২.১৬	৮.৫২
	১৯৬১	১, ২২১, ২২৩	৭৮.৪৫	১০.২৩	৩.১৫	৮.১৪
	১৯৭১	১, ৬১২, ৬৫৭	৭৫.৪২	১৩.৩৩	৩.১৪	৮.১১
উত্তরবঙ্গ	১৯৫১	৩, ৬৮২, ১০২	৬৬.৬৪	৭.১০	১৪.৩২	১১.২৪
মোট সংখ্যা	১৯৬১	৫, ৫৪২, ৪৫৫	৬১.০২	২.৫১	১৬.১২	১৩.১৫
	১৯৭১	৭, ৪১৮, ৬৬৩	৬০.১২	১৩.৮৩	১৩.৮৫	১২.১৩

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে কিরাত সংস্কৃতি বলা হয়। একে মিশ্র সংস্কৃতিও বলা চলে। একদিকে হিন্দু সংস্কৃতি বা আর্য সংস্কৃতি ও অন্যদিকে কিরাত সংস্কৃতির মিলনে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলা হয়। অনেক গবেষক এবং গ্রন্থকারও একথা বলেছেন। ১৯৩১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাই যে উত্তরবঙ্গের সমগ্র জেলায় রাজবংশী

কোচ, মুণ্ডা, ওঁরাও, টোটো, ভুটিয়া, নেপালী ও সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষ নানা রীতিনীতি ও আচার কৃষ্টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই বাস করে আসছে।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে নানাজনে নানা কথা বলেছেন। কয়েকজন ইংরেজ লেখক যেমন - জে.ডি.হুকারের হিমালয়ান জার্নাল (১৮৫৪), ই.টি. ডাল্টনের হিমালয়ান জার্নাল (১৮৫৪), ই.টি. ডাল্টনের ডেস্ক্রিপটিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল (১৮৭২), ডাবলু.ডাবলু. হাণ্টারের ষ্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অব্ বেঙ্গল, বি.এইচ. হজসনের প্রিসেলেনিয়াস এসেস, এ ম্যাকেণ্ডির নর্থ ইণ্টারন্ ফণ্টিয়ার অব্ বেঙ্গল, আই. সাণ্ডারের সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট অব্ ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স ইত্যাদি লেখকগণ রাজবংশী জাতি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কোচ-বিহারের ষ্টেট অ্যাণ্ড ইটস্ ল্যাণ্ড রেভেনিউ সেটেলমেণ্ট (১৯০৩), খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লার বাঙলা ভাষায় লেখা কোচবিহারের ইতিহাস (১৯৩৬), শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কিরাতজনকৃতি (১৯৫১), শ্রী চারুচন্দ্র সান্যালের দি রাজবনসীস অব নর্থবেঙ্গল(১৯৬৫) প্রভৃতি গ্রন্থে রাজবংশী জাতি সম্পর্কে নানা তথ্য ও বিবরণ আছে একথা মোটামুটি সকলেই বলেছেন যে রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে কিন্তু এরা মূলতঃ কোচ। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"The masses of the North Bengal areas are very largely of Bodo origin, or mixed Austric - Dravidian-Mongoloid, where groups of peoples from lower Bengal and Bihar have penetrated among them. They can now mainly be described as Koch i.e., Hinduised or semi Hinduised Bodo who have abandoned

their original Tibeto-Burman speech and have adopted the Northern dialect of Bengali and when they are a little too conscious of their Hindu religion and culture and retain at the same time some vague memory of the glories of their people, particularly during the days of Visva Simha and Nara-narayana, they are proud to call them selves Raj-bansis and to claim to be called Kshatriyas". [৫]

নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকগীতি গ্রন্থে বলেছেন :

"কোচবিহারের কোচ উপজাতিগণের এক বিরাট অংশ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত এই কোচ সম্প্রদায়ই কালক্রমে রাজবংশী' নামে পরিচিত হয়, অনেকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকেন।" [৬]

রাজবংশী জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে এই রকম : কোচদের প্রথম নায়কের নাম হাজো। তিনি বোড়ো জাতির মানুষ ছিলেন। হীরা ও জীরা হাজোর দুই কন্যার বিবাহ হয়েছিল আসামের গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত চিকা পাহাড় নিবাসী হরিদাস নামীয় কোন মেচের সঙ্গেঁ। জীরার গর্ভে চন্দ্রন ও মদন এবং হীরার গর্ভে শিশু ও বিশু নামে দুটি করে সন্তান হয়। হাজোর দৌহিত্র চন্দনই কোচদের প্রথম রাজা। চিকা পাহাড়ে এর রাজ্য। ক্রমে চিকা পাহাড় থেকে কোচবিহারের দিকে সরে আসেন। চন্দনের মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই (মাসতুতো) বিশু কোচবিহারের রাজা হলেন। তিনি নাম নেন বিশ্বসিংহ।

বিশ্বসিংহ মুসলমানদের হাত থেকে কিছু অঞ্চল দখল করেন। বিশুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিশু শিশ সিংহ নাম নিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের অধিপতি হলেন। এই বংশের পরিচয় হল 'রায়কত'। দুই ভাই জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার রাজ্যের অধিপতি হলেন। এঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং রাজবংশী হিসেবে অভিহিত হলেন। এরপর কোচ নাম মুছে যায় কিন্তু অন্য আর একটি মতে রাজবংশীদের ঐতিহ্য খুব প্রাচীন এবং এরা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজবংশীরা ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরকে বাহে অর্থাৎ বাবাহে বলে সম্বোধন করে। এইজন্য কেউ কেউ এই জাতিকে 'বাহে' জাতি এবং এদের ভাষাকে 'বাহে ভাষা' বলে থাকে। কিন্তু এটা বিকৃতি মাত্র। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ উপভাষাতেই (বাংলার) কথা বলে। তবে উত্তরবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বাচনভঙ্গিতে অর্থাৎ উচ্চারণে ও শ্বাসাঘাতে ভিন্নতা রয়েছে। বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, আসামের গোয়ালপাড়া এবং বিহারের ভাষার সঙ্গে মিল রয়েছে খানিকটা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ রীতি ভিন্ন ভিন্ন। নারী ও পুরুষের উচ্চারণরীতিও ভিন্ন। শহরের মানুষ এবং গ্রামের মানুষের উচ্চারণরীতিতেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার প্রসারে সম্প্রতি উচ্চারণরীতিতেও মার্জিত ভাব এসেছে। রাজবংশী অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতমূলক, মধ্যে মধ্যে পারসীমূলক শব্দেরও ব্যবহার আছে। মেচ ও কাছারি ভাষার শব্দও অনেক পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তবুও এ ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। এই প্রসঙ্গে গ্রিয়ারসন সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য :

> "When we cross the river (Brahmaputra) coming from Dacca, we meet a well marked form of speech in Rangpur and the districts to its North-East. It is called Rajbangshi!"[৭]

প্রাচীন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ছিল সাহিত্য ও শিল্পচর্চার আদিকেন্দ্র। কোচবিহার রাজবাড়িতে সাহিত্যচর্চার প্রমাণ রয়েছে। মূলতঃ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়েই প্রশাসনিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিশেষ সূচনা হয়। সাহিত্যচর্চা এর মধ্যে একটি অন্যতম দিক। রাজার নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। সেখানে অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। কয়েকটি বৈষ্ণবীয় পুঁথি যেমন জন্মাষ্টমী, ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধ, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন দাস, শ্রীভাগবত কবচ, চৈতন্যচরিত, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সঙ্গীতেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি লোকগীতি ও উপাখ্যান সমূহেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সাধারণ মানুষও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানকে খুবই পছন্দ করে।

আমাদের গবেষণার বিষয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ, অভ্যাস রীতিনীতি এবং জীবনধারণের নানা দিক। এই সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ অভ্যাস ও রীতিনীতিতে অভ্যস্ত। সম্প্রতি শিক্ষার প্রসারে সমাজব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন এসেছে কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষের অভ্যাস ও রীতিনীতি অপরিবর্তিতই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> "উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও সংস্কৃতিতে এই ব্যাপক অভিবাসন বা পুর্নবসতি এক প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন সময়ে আসা নানা সম্প্রদায়ের জনগোষ্টীর ভিন্নমুখী জীবনধারার চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, ফলে এতদঞ্চলে বহিরাগত সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সহাবস্থান একইসঙ্গে ঘটেছে। স্বভাবতই রাজবংশী জীবনধারা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে পারছে না, তাকে নব্য সংস্কৃতি তথা মিশ্রসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতে হচ্ছে।" [৮]

আগে গ্রামের মহিলারা বিশেষ করে বয়স্ক মহিলারা 'ফোতা' পরত। একটুকরো কাপড়ে বুকের চারদিকটা ঘিরে রাখত। এই বিশেষ কাপড় পরার ধরণকে 'ফোতা' বলে। প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চল ছাড়া ফোতার প্রচলন কমে এসেছে। আর পুরুষরা ধুতি পরে থাকে। রাজবংশী মহিলারা গহনা পরতে ভালবাসে। সাধারণতঃ রূপার গহনারই প্রচলন বেশি। সমৃদ্ধ পরিবারের মেয়েরা সোনা ব্যবহার করে। মহিলাদের বিশেষ অভ্যাসের মধ্যে তারা পান খায়। বিড়ি ও তামাকও সেবন করে। পুরুষরা হুঁকোতে তামাক খায়। রাজবংশী রমণী এবং ঐটি একটি বিশেষ অভ্যাস।

রাজবংশী মানুষ সাধারণ বাঙালী খাবারই খায়। যেমন - ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি ইত্যাদি। তবে রাজবংশী সমাজে বিশেষ খাবারের প্রচলন রয়েছে যা এই সমাজের মানুষের খুবই পছন্দ। তা হল শুকনো মাছ মান ডাঁটা সহযোগে গুঁড়ো করা হয়। সেগুলি সমুৎসরের মুখরোচক খাবার হয়। একে বলা হয় 'সিদোল'। আর একটি বিশেষ খাবার শাকপাতা সহযোগে তৈরি হয়। যেমন - 'ছ্যাঁকা', 'প্যাঙ্কা' ইত্যাদি। এছাড়া শুকনোমাছ পোড়া সিঁদোল পোড়া এ সমাজের মানুষের অতি প্রিয় খাবার। বেগুন আলু পোড়া এ অঞ্চলের মানুষ 'সিজা' বলে। এ ধরণের খাবারও খুব খায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মানুষ বেশির ভাগই গ্রামে বসবাস করে। সমাজে অল্প-বিস্তর জমির মালিক যেমন রয়েছে তেমনি কিছু জোতদারও রয়েছে। যারা জোতদারের জমি ভাগচাষ করে তাকে বলা হয় 'আধিয়ার'। আরও এক ধরণের জমির মালিক রয়েছেন তাদের স্বল্প সংখ্যক জমি রয়েছে সেই সঙ্গে অন্য জোতদারের কিছু জমি চাষ করে থাকে। এই শ্রেণীর জমির মালিককে 'মুলানডার' বলে।

গ্রামের মানুষরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। এক একটি এলাকাকে 'টারি' বা 'চাতাল' বলা হয়। এক একটি টারি বা চাতালে ২০-২৫ ঘর মানুষের বাস থাকে। বেশির ভাগ

মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ১৯৭১ সালের লোক গননায় দেখা গেছে যে শহরে কাজ করা পুরুষের সংখ্যার ২১ শতাংশই রাজবংশী, রমণীর সংখ্যা ৬.৫০ শতাংশ। তুলনায় অন্যান্য উপজাতির মেয়েরা খনিতে বা কারখানায় বেশি কাজ করে, রাজবংশী মেয়েরা কম কাজ করে। খনি অথবা কারখানায় কাজ করা অন্যান্য উপজাতির রমণীর সংখ্যা ৫৮.৪৫ শতাংশ আর রাজবংশী রমণীর সংখ্যা ১০ শতাংশ। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ১৯৬১ সালে রমণী কৃষক ছিল ৭৮.৫৬ শতাংশ, ১৯৭১ সালে কমে ২১.৪৬ শতাংশ হয়। গ্রামাঞ্চলে ১৯৫১ সালে রাজবংশী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২.৫২ শতাংশ, ১৯৭১ সালে ৩.৫৩ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৫১ শতাংশ রাজবংশী মানুষ কৃষি নির্ভরশীল বাদবাকী ৪১ শতাংশ রাজবংশী মানুষ অন্যান্য কাজের উপর নির্ভরশীল।

রাজবংশী সমাজ পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক গ্রামে দু-এক ঘর সম্পন্ন পরিবার ছাড়া অন্যদের অবস্থা নিতান্ত সাধারণ। এককালে কমবেশি সব পরিবারের কিছু না কিছু আবাদি জমি ছিল। এখন অনেকেরই দারিদ্র নিত্যসঙ্গী। মোটামুটি ৩০-৪০ বিঘা যার আবাদি জমি থাকে সেই জোতদার হিসেবে পরিগণিত হয়। পূর্বে জমিদার প্রথা ছিল কিন্তু প্রকৃত অর্থে জমি রাজবংশী সমাজে খুব বেশী ছিল না। সম্প্রতি জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে মোটামুটি বৃহৎ জমির মালিকরা ছোট জোতদারে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এক একটি গ্রামে মোট দু-চারজন বড় জোতদার থাকে এবং এদের বিপরীতে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দৃষ্ট হলেও এখনও সাধারণভাবে বেশির ভাগ মানুষের ৭-৮ বিঘা জমি, ৩-৪টি গরু, কিছু ছাগল, হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি থাকে।

ধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সব কৃষকরাই ধান উৎপন্ন করে থাকে। দুই মরশুমে ধান উৎপন্ন হয়। শীতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে যে ধান ওঠে তাকে বলা হয় 'হেমতী' ধান অর্থাৎ 'আমন' ধান। আর বর্ষায় যে ধান ওঠে তাকে বলা হয় 'আউষ' ধান।

আর বর্ষায় যে ধান ওঠে তাকে বলা হয় 'আউষ' ধান। সম্প্রতি সরকার থেকে নানারকম উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা আই-আর-৮, তাইচুন ইত্যাদি। এছাড়া পাট ও তামাক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আউষ ধানের নানারকমের আছে যেমন, মেঘ আন্ধারী, ডুমরা, কালোশানি, মালশিরা, ভাদোই, ধোলি, বোয়ালদার ইত্যাদি।

এই সমাজে তাঁত বোনার প্রচলন নেই। জাতব্যবসা হিসেবে মাছ ধরারও প্রচলন নেই। তবে রাজবংশী পুরুষরা মাছ ধরতে ভালবাসে এবং রমণীরা একসময়ে কাপড়ও বুনত।

সমাজে যন্ত্রচালিত গাড়ি অথবা ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন নেই। প্রায় সকল পরিবারে গরুরগাড়ি রয়েছে। এই গাড়ি করেই মানুষ একসময় দূরদূরান্তে যেত, এছাড়া বিবাহ উপলক্ষে এই গাড়ির বহুল প্রচলন ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে গাড়ির ওপরের অংশও সুন্দর করে ছাউনি দেওয়া হত। সম্প্রতি ব্যস্ততার যুগে যন্ত্রচালিত গাড়ির বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়াতে গরুরগাড়ির প্রচলন কমে এসেছে। জলযান অথবা নৌকার প্রচলন ছিল অনেক অতীতে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত স্থানগুলিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - স্থানের নামের সঙ্গে গুড়ি, মারি, কাটা, বাড়ি ইত্যাদির সংযোজন। গুড়ি অর্থাৎ গাছের গোড়াকে বোঝানও হয়। যেমন - জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, শিমুলগুড়ি, কাঁঠালগুড়ি ইত্যাদি। কোথাও বা ঝাড় বা জঙ্গল স্থানের নামের পূর্বে বা পরে সংযোজিত হয়েছে যথা - ডাঙ্গুয়া ঝাড়, ঝাড় যাগুরমারি, ঝাড় আলতাগ্রাম ইত্যাদি। আবার কোথাও 'মারি' কথাটা এসেছে যেমন - শিঙ্গিমারি, বোয়ালমারি, দ্বারিকামারি, চ্যাঙমারি, মোয়ামারি, খলিসামারি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি স্থানের নামের পূর্বে মাছের নাম রয়েছে। অর্থাৎ অঞ্চলগুলিতে উপরিউক্ত মাছগুলি বেশি মারা হয়। আবার কোন অঞ্চলের

নাম নাগরাকাটা, মোগলকাটা, গয়েরকাটা, ফালাকাটা, শিবকাটা, খয়েরকাটা, ইত্যাদি। কোন কোন অঞ্চলের বাড়ি দিয়েও রয়েছে। যথা - বাতাবাড়ি, ওয়াশাবাড়ি, আটিয়াবাড়ি, ওদলাবাড়ি ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রামের নামকরণেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন - ডাঙ্গাঁপাড়া উঁচু জায়গাকে ডাঙ্গাঁপাড়া বলা হয়। আমগুড়ি - যেখানে অনেক আম আছে। পলাশবাড়ি - যেখানে অনেক পলাশফুল ফোটে।

রাজবংশী পুরুষদের নামের আগে যেমন উ, উয়া, লু ইত্যাদি আসে। যেমন - যে ঘুমায় বেশি তাকে বলা হয় নিন্দালু। তেমনি মেয়েদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয় - নী, শ্বরী, শোরী ইত্যাদি। আবার বিশেষ কারণ দেখা দিলে সে হিসেবে নামকরণও হয়ে থাকে যেমন যার সাতমাসে জন্ম তাকে বলে সাতাসী, অন্ধকার রাত্রে জন্ম যার তাকে বলা হয় আঁধারি। টেপা মাছের পেটের মত যার মোটা পেট তাকে বলা হয় টেপেরি। সাধারণতঃ - সুকাই, ঝগড়ী, বেঙী, বুদি, পাতিলি, জউলী, টেংসী, জলো ইত্যাদি নামকরণ করা হয় মেয়েদের। এ প্রসঙ্গে প্রাক্ত উত্তরবঙ্গের লোকগীতি গ্রন্থে শ্রী নির্মলেন্দু ভৌমিকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :-

> "কোন একটি সমাজের নিজস্ব বিশিষ্ট পরিচয় নিহিত থাকে সেই সমাজের দেওয়া স্থান, নদী ইত্যাদির নামের মধ্যে। প্রাক্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থান ও নদীর নামগুলি লক্ষ্য করিলে সেই সমাজের আন্তর পরিচয় পাওয়া যাইবে।" [১]

শিক্ষার হার আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় স্বাধীনোত্তর কালে অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে তুলনায় রাজবংশী মানুষের স্থান তৃতীয় ছিল। ১৯৬১ সালে দেখা গেল রাজবংশী সমাজ শিক্ষায় আরো কিছুটা এগিয়ে তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। ১৯৭১ সালের গণনায় শিক্ষার হার নিম্নরূপ দেখা যায় :

দার্জিলিং	২২.১৩ শতাংশ
কোচবিহার	১৬.২৩ শতাংশ
জলপাইগুড়ি	১৩.১১ শতাংশ
মালদহ এবং পশ্চিমদিনাজপুর	১২.১০ শতাংশ

রাজবংশী পুরুষের তুলনায় রাজবংশী রমণীরা অনেক কম শিক্ষিত। ১৯৬১ - ১৯৭১ সালে রাজবংশী মেয়েরা মাত্র ৭.৬৮ শতাংশ শিক্ষিত ছিল অন্যান্য গোষ্ঠীর মেয়েদের তুলনায়। শ্রী রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে ১৯৬১-১৯৭১ সালের রাজবংশী সমাজে শিক্ষার হার দেখিয়েছেন - [১০]

জেলা	বছর	রাজবংশী		সব মোটসংখ্যা
		পুরুষ	মেয়ে	
দার্জিলিং	১৯৬১	৪০.০৫	৫.৫৯	২৪.৬৬
	১৯৭১	৩৭.৮৪	৬.০৬	২২.১৩
জলপাইগুড়ি	১৯৬১	১৪.৬৭	৩.০০	৯.২৩
	১৯৭১	২৩.৮১	৭.৭১	১৫.৬২
কোচবিহার	১৯৬১	২৮.৭১	৫.২৩	১৭.৫২
	১৯৭১	২৪.০৭	৯.২৮	১৬.২৩
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৬১	২২.৪৪	২.২১	১৩.০৫
	১৯৭১	১৯.৪৪	৩.২০	১২.১০

জেলা	বছর	রাজবংশী		সব মোটসংখ্যা
		পুরুষ	মেয়ে	
মালদহ	১৯৬১	২০.০৬	২.১০	১১.২৯
	১৯৭১	২১.২৩	৪.৪৯	১৩.১১
উত্তর বাংলা	১৯৬১	২৩.১২	৪.০১	১২.৮৩
	১৯৭১	২৩.৬২	৭.৬৮	১৫.৮৫

বাড়িঘর নির্মাণেও রাজবংশীদের মধ্যে বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন এদের বাড়িতে দুটি ভাগ থাকে। বাইরের ভাগকে বলা হয় খলতোবাড়ি অথবা আইগদোবাড়ি। আর ভেতরের অংশটুকু হয় থাকবার ঘর রান্নাঘর ইত্যাদি। বাইরের ভাগে ডারিঘর অথবা বসবার ঘর প্রতিটি বাড়িরই একটি বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারগুলিতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঘরগুলি বেশ উঁচু হয়, এবং লেপা মোছা ও পরিষ্কার থাকে। জোতদার শ্রেণীর ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ গ্রামের নেতা অর্থাৎ 'দেউনিয়া' বা 'দেওয়ানি'। তাঁর ডারি ঘরেই সাধারণত গ্রামের বিভিন্ন ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। সম্প্রতি পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থাকাতে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ও সমাধান পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

রাজবংশী রমণীগণের শরীরের গড়ন ভাল। রং কালো ফর্সা দুইই হয়। মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজ করে থাকে। সন্তান পালন, রান্না করা ও বাড়ির আশেপাশের বাগান পরিচর্যা মেয়েরাই করে। দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে মাঠেও কাজ করে। অল্পবয়সি মেয়েরাও সংসারের সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। জমিতে ধান বপন করা

থেকে ধান কাটা সমস্ত কাজেই মেয়েরা পুরুষদের সাহায্য করে। তামাক বোনা এবং তামাক তোলা - সব কিছুতেই মেয়েরা সাহায্য করে। বাড়ির গবাদি পশু যেমন - গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির যত্ন মেয়েরাই করে। এছাড়া হাঁস, মুরগী, পায়রা মেয়েরাই পালন করে। এভাবে অনেক রাজবংশী মেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সুনির্ভর হয়। দরিদ্র রমণীরা সপ্তাহান্তে হাটে যায়। এরা রান্নার কাঠ সংগ্রহে বনাঞ্চলে যায়, বাঁশবন থেকে রান্নার কাঠ সংগ্রহ করে থাকে। বাড়ির রান্নার সরঞ্জাম, আনাজ বা জ্বালানির ব্যাপারে পুরুষরা কখনও মাথা ঘামায় না।

রমণীরা ধান থেকে নিজেরাই চাল করে। বড় রকমের উদুখলের মত দেখতে, একে বলা হয় 'সাম গাইন' এতে ধান থেকে চাল করা হয়। মেয়েরা বাড়িতেই চিড়ে কোটে এবং মুড়ি ভাজে। সম্প্রতি মেশিনের বহুল প্রচলন হওয়াতে ধান, গম সব মিলেই ভাজা হয়। তবু গ্রামাঞ্চলে 'সামগাইনে'র ব্যবহার এখনও বহুল পরিমাণে রয়েছে। মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরণের পূজা পার্বন সব মেয়েরাই করে। মেয়েরাই একরকম রাজবংশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। তুলনায় দেখা গেছে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী।

সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় এদিক থেকে সমাজে খানিকটা আদিমতার ছোঁয়া রয়েছে। বয়স্ক পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক সমাজে সকলের সম্মান পেয়ে থাকে। কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে গ্রামের পঞ্চায়েত সমাধান করে। কোন বাড়ির বৈঠকখানায় এ সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। গ্রামের জমিদার অথবা বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তিও এতে অংশ গ্রহণ করে এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যমী হয়। গ্রামের কোন মহিলা এতে অংশগ্রহণ করে না।

গ্রামের কোন যৌথ কাজ অথবা কারও কোন বিশেষ সমস্যা যৌথভাবেই অংশগ্রহণ করে। মাছ ধরা, শিকার করা এরা দল বেঁধে করে। বিবাহ অথবা মৃতব্যক্তির সৎকারে গ্রামের মানুষ যৌথ ভাবে অংশগ্রহণ করে। কখনও বা গ্রামে চোর ডাকাতের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দল বেঁধে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। রাজবংশী সমাজে একতা লক্ষ্য করা যায়। কোন কারণে কারও মধ্যে বিরোধ থাকলে বিপদ বা উৎসবে তারা তা মিটিয়ে নেয়। দলবদ্ধতা অথবা গোষ্ঠীবদ্ধতা এই সমাজের বিশেষ লক্ষণ। কোন সমস্যা উপস্থিত হলে সমাজের মানুষ একত্রে অংশগ্রহণ করে মিটিয়ে নেয়। অনেকটা একই পরিবারের মত। পরিবারে যেমন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের অভিভাবক হন তেমনি সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি সমাজের অভিভাবক হন।

রাজবংশী সমাজে বিবাহরীতির একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। নিজগোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ হয়ে থাকে। 'ঘটক' অথবা 'কারোয়া' বিবাহ স্থির করে এবং দুপক্ষের অভিভাবকের মত থাকলেই বিবাহ হয়। অনেক সময় পাত্রপাত্রী নিজের মতে অথবা ভালবেসে বিবাহ করে। যদি সে বিবাহ রাজবংশী সমাজের মধ্যে হয়ে থাকে তবে সেই মেয়ে রাজবংশীই থেকে যায়। অনেক সময় মেয়ের কোচ, মেচ, ধীমাল ও বর্ণ হিন্দু পুরুষের সাথে বিবাহ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মেয়েটি আর রাজবংশী থাকে না। আবার কোন মেয়ে মুসলমান অথবা অন্য কোন বর্ণের পুরুষকে বিবাহ করলে সে আর রাজবংশী থাকে না। সমাজ তাকে আর গ্রহণ করে না এবং কোন উৎসব অথবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যদি কোন মেয়ে মুসলমান বিবাহ করে এবং তিনচার বছর পরে ফিরে আসে সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বিবেচনা করবে সে সমাজে থাকবে কি থাকবে না। সেক্ষেত্রে কোন রাজবংশী পুরুষ এগিয়ে আসতে পারে মেয়েটিকে বিবাহ করার জন্য। মেয়েটির পুনর্বিবাহ হলেও সে রাজবংশী সমাজে যোগ্য স্থান পাবে না। আচার অনুষ্ঠানে মেয়েটি অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

রাজবংশী সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান অন্যান্য সমাজের মতই হয়ে থাকে। বিবাহে পণের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক অতীতে পাত্রীর পিতাই পণ গ্রহণ করত এখন পাত্রের পিতা পণ গ্রহণ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পণ ছাড়াই বিবাহ হয়। সমাজে ভালবাসার বিবাহকে সহজভাবেই গ্রহণ করা হয়।

সমাজে 'ঘরজামাই' ব্যবস্থাও রয়েছে। বিবাহের পর পাত্র পাত্রীর বাড়িতে পাকা-পাকি ভাবে থেকে যায়। পাত্রীর পিতার দ্বিতীয় কোন সন্তান না থাকলে অথবা পাত্রীর পিতার বিশেষ অসুবিধা থাকলে 'ঘরজামাই'এর ব্যবস্থা করে থাকে। পুরুষটি মেয়ের বাড়িতে এসে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। যদি মেয়ের দরিদ্র পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়, অনেক সময় কন্যার পিতা তার বাড়ির সংলগ্ন একখন্ড জমিতে ঘর করে দেয় মেয়েকে থাকবার জন্য। এটি ঘরজামাই ব্যবস্থা নয়।

রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। অনেক রাজবংশী পুরুষ পত্নী বিয়োগের পর কোন বিধবাকে সামান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘরে তোলেন। কন্যার অভিভাবকের সঙ্গে মৌখিক চুক্তি হয় মাত্র। রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহের নানা পদ্ধতি রয়েছে। যেমন 'পরফেত্রী কাচুয়া', 'ডাংগুলি বিবাহ' ও 'গাওগছু বিবাহ' ইত্যাদি।

রাজবংশী সমাজে আর একধরণের প্রথার প্রচলন রয়েছে, অবশ্য সম্প্রতি তার বিলুপ্তি ঘটেছে। রাজা অথবা জমিদার অথবা কোন বিত্তশালী কোন অবিবাহিতা মেয়েকে রক্ষিতা হিসেবে রাখত। সেক্ষেত্রে মেয়েটিকে বলা হয় কইনাপাত্র। এদের সন্তানেরা বৈধ নয় এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

রাজবংশী সমাজে 'ঘর সোঁদালী' বিবাহের প্রচলন ছিল। যখন পুরুষ এবং মহিলার ইচ্ছা সত্তেও অভিভাবকের অনিচ্ছা রয়ে যায় যেহেতু মেয়েটি বিবাহিতা। সেক্ষেত্রে

যদি পুরুষ ও মহিলাটি জোর করে বিবাহ করে অর্থাৎ মেয়েটি পুরুষটির ঘরে আসে, এই ঘটনাকেই বলা হয় 'ঘর সোঁদালী'। এই অবস্থায় স্ত্রীটিকে তার আগের স্বামীকে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হয়। টাকার পরিমাণটা গ্রামবাসীরা ঠিক করে দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন বিধবার সঙ্গেই এই ধরণের বিবাহ হয়ে থাকে। সমাজ এদের হেয় ও অবজ্ঞার চোখে দেখে। স্ত্রীলোকটিকে বলা হয় 'পাচুয়া' এবং পুরুষটিকে বলা হয় 'সঙ্গনা'। সমাজের বয়স্করা বিচারসভায় বসে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে -

কহেন তোমরা
নিজে আসি ঘর
সঁধাইচ, না বুড়া টানিয়া ঘরত আইনছে

মেয়েটি বলে -

না বাপো, মুই আগোত
ঘর সন্‌ধাইসি।

রাজবংশী সমাজে আরও এক ধরণের বিবাহ কখনো হয়ে থাকে - মৃত ভাইয়ের স্ত্রীকে অনুজের বিবাহ করা। সমাজ এ ধরণের বিবাহকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করে নেয়, কারণ এটা অনেক সময়ই প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে থাকে। সামান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। 'ছত্রদানী' বিবাহেরও প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ বিবাহিত মহিলার পুনর্বিবাহ। কোন বিবাহিত মহিলা তার স্বামী জীবিত থাকাকালে অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে যদি স্বামী দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে অথবা ভরণপোষণ দিতে অপারগ হয়। অনেক সময় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসে কন্যার পিতার কাছে মেয়েকে অর্থাৎ তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায়। সেক্ষেত্রে কন্যার পিতা তার মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে গররাজী হয় এবং অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে। সেই মেয়েটিকে গ্রামের পঞ্চায়েতের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় না। সমাজ এই বিবাহকে বৈধ ভাবে গ্রহণ করে থাকে।

সমাজে 'পানিছিটা' বিবাহের প্রচলন রয়েছে। যখন কোন বিবাহেচ্ছু যুবকের বরপণ দেবার ক্ষমতা থাকে না তখন সে কন্যার পিতাকে অনুরোধ করতে পারে সামান্য জল ছিটিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে। এরপর তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সহবাস করতে পারে। কিছুদিন পর পুরুষটির কিছু উপার্জন হলে সে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারা সমাজে বৈধ স্বামী স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং সন্তানেরাও বৈধ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমাজে 'ঘর-জায়া' বিয়ার প্রচলন রয়েছে। এটা একটি সহজ স্বাভাবিক বিবাহ অনুষ্ঠান। এক্ষেত্রে কোন অনাথ অথবা দরিদ্র বিবাহেচ্ছু যুবক, যার বরপণ দেবার ক্ষমতা নেই তাকে কন্যার বাড়িতে আনা হয়। সেই পুরুষটিকে কিছুদিন থাকতে হয় এবং বাড়ির কাজকর্ম করতে হয়। এই সময়ের মধ্যে যুবকটি মেয়েটির সঙ্গে কোনরকম শারীরিক সম্পর্ক রাখবে না। ইতিমধ্যে কন্যার পিতা যুবকটিকে উপযুক্ত বিবেচনা করলে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের স্বামী স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। বিবাহের পরবর্তীকালেও ছেলেটি শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

'ফুলবিয়া' নামে আর একধরণের বিবাহের প্রচলন রয়েছে। এই বিবাহ সত্যিকারের বিবাহের মত সামাজিক স্বীকৃতি পায়। ঘটকের মাধ্যমে অভিভাবকগণ বিবাহ স্থির করেন। পাত্র সবসময় একজন কুমারী মেয়েকেই বিবাহ করে। এই ধরণের বিবাহে ফুল অথবা সায়েরা পাত্রপাত্রীর মাথায় বাঁধা হয়। একজন অধিকারীর অবশ্যই প্রয়োজন হয়।

হিন্দু সমাজের বিবাহনুষ্ঠানের মতই রাজবংশী সমাজে বিবাহ হয়ে থাকে। তবে কিছু লোকাচারের নিজস্বতা অবশ্যই আছে। বিবাহনুষ্ঠানে সঙ্গীতেরও প্রচলন রয়েছে। বলা বাহুল্য, সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথাগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। উপরে বর্ণিত বহু ধরণের বিবাহ আজ আর চালু নেই।

অনেক পূর্বে পাত্রের পিতাকেই কন্যাপণ দিতে হত। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হয়ত এখনও সে ব্যবস্থা অটুট রয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কন্যার পিতাকেই বরপণ দিতে হয় শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজের অনুকরণে। পূর্বে বহুবিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। সমাজে বিবাহ সহজে ভেঙেও যেত। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে এর মিল ছিল আজ তা আর নেই। অনেক আগে মেয়েদের বিবাহের বয়স ছিল ১৬।১৭ এবং ছেলেদের বিবাহের বয়স ২১।২২ বছর। পরবর্তীকালে প্রকৃতপক্ষে 'অগ্রণী' বর্ণহিন্দু সমাজের প্রভাবেই বিবাহের বয়স কমে ৯।১0 বছর। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও 'কইন্যা ব্যাচা' পদ্ধতি হয়ত রয়েছে। পাত্রীর বাবা মেয়েকে পণের বিনিময়ে বিয়ে দেয়। একে 'বেচেখাওয়া' বলা হয়। পঞ্চাশ বছর পূর্বে কন্যার বিক্রয়মূল্য ছিল ৫0 অথবা ১00 টাকা। কুমারী মেয়েকে বলা হত 'ফুল'। সেক্ষেত্রে তার বিক্রয়মূল্য ৪00 টাকা। মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহের ক্ষেত্রে বলা হত 'দেদিয়া'। এক্ষেত্রে তার বিক্রয়মূল্য ১00 টাকা। 'তেতিয়া' অর্থাৎ তৃতীয়বার বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন বিক্রয়মূল্য নেই। সাম্প্রতিক কালে সমাজের কুপ্রভাবের ফলে সাধারণ বর্ণহিন্দু সমাজের ভঙ্গিতে রাজবংশী 'পাত্র'ও অথবা পাত্রের পিতা কন্যার পিতার নিকট অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রি দাবি করে থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদ রাজবংশী সমাজে একসময়ে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বেশ মিল ছিল। বিচ্ছেদের পর কোন খোরপোষের ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু তবুও কেবলমাত্র প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক পরিবারে সহজেই বিবাহবিচ্ছেদ হত। শিক্ষিত সচ্ছল বা চাকুরে পরিবারে বিবাহবিচ্ছেদ সহজে ঘটে না। নানা কারণে বিচ্ছেদ ঘটে। যখন স্বামী স্ত্রী দুজনে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে থাকতে চায় না কিংবা স্ত্রী অথবা স্বামী কোন অবৈধ প্রেমে লিপ্ত কিংবা স্ত্রী অথবা স্বামী যৌনরোগগ্রস্ত এবং সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ অথবা স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ অথবা স্বামী পুনর্বিবাহ করেছে সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ হতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন আইনের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না। গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা এর বিচার করত।

পূর্বে বিবাহ সম্পর্কে সমাজ খুবই শিথিল ছিল। কেবলমাত্র মেয়ে পুরুষের সম্মতিক্রমে ওরা একত্রিত হত এবং স্বামী স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করত। এরপর যে সন্তানের জন্ম হত তারা বৈধ বলেই স্বীকৃতি পেত। সাম্প্রতিক কালে সব বিবাহই নিয়মানুসারে সিদ্ধ হয়। পূর্বে রাজবংশী সমাজে বিবাহব্যবস্থা ছিল অনেকাংশেই আদিবাসী সমাজের আদলে। তাই তাতে খানিকটা আদিমতার ছোঁয়াও ছিল। বিবাহবন্ধনও কখনও শক্ত ছিল না। সবসময়ই ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা ছিল। দরিদ্র পরিবারগুলিতে এ প্রথা আজ পর্যন্ত কিছুটা রয়ে গেছে। পূর্বে বিবাহের জন্য কোন বিশেষ বস্ত্রও ছিল না। ফোতা অথবা মিলের তৈরি কাপড় এবং কিছু রূপোর গহনাই বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশ্য দরিদ্র অবস্থাই এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

বিবাহ ধার্য করত পাত্রপাত্রীর অভিভাবকগণ। যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে তাকে বলা হয় 'কারোয়া'। তাছাড়া হাটে বাজারে মানুষজন মিলিত হয় এবং বিবাহ সম্পর্কে কথাবার্তা বলে থাকে। প্রায় সেখানেই বিবাহ স্থির হয়। পরবর্তীতে দুপক্ষের অভিভাবকগণ যাওয়া-আসা করে এবং বিবাহের নির্দিষ্ট দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট দিনে পাত্রপক্ষ মানুষজন সহ কন্যার বাড়িতে যায়। স্বাভাবিক অভ্যর্থনা খাওয়া-দাওয়ার পর পুরোহিত পাত্রপাত্রীর দুই হাত একত্র করে এবং বৈদিকমতেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি দিয়ে গান করে এবং পাত্রপাত্রীর উপর খই ছিটানো হয়। বলাবাহুল্য, সময়ের প্রবাহে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বিবাহে পাত্র একজন মিত্র বা বন্ধু রাখে। একে বলা হয় 'মিত্র ধরা'। পুরোহিত মন্ত্র সহযোগে সে বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

বিবাহের গান :

পাত্র বিবাহানুষ্ঠানে এলে মেয়ের বাড়ির কোন বয়স্কা রমণী এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে এবং মেয়েরা গান করে :

বাশের খোপটা হ্যালেক ল্যাকা
পন্থে অনেক দূর
এ্যালানে আসিল্ বর রে
কুড়া কুতা।

অপর একটি গান :

ছিকো ছিকো যাইগে তোর কপালোতে
কালো যাসে না তোর বাদে আছে।

আবার :

কি দ্যাখছিস বাপোই রে তুই
চান্নি কুলার ভিতি
সেই চাননি গরাইসে তোর যাও জোলোনী।

পানি ছিটা গান :

চিনিহা আখিস রে বাপোই
চিনিহা আখিস
শাশুড়ী ছিটাছে পানি
চিনিহা আখিস।

ধান দেওয়া গান :

হামার যাইওয়োর হাতোৎ
দান পৈল গে
টাকা দান পৈ
দুলহার মনটা
ভাবেনাত্ পৈল গে
ভাবেনাত পৈল।

খই খেলা গান :

কিয়া খ্যালাইতো বাপোই
হারিবো রে
ন্যায় ন্যায় তোর বাপের দাড়ি
ডুবালো রে।

যজ্ঞের গান :

বামন চাহে ধুতি
বামন চাহে ধুতি
বামনের বাদে আনিয়া থুইচি
মরা গরুর ভুটি।

বিবাহের মত মৃত্যুতেও রাজবংশী মানুষ প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠানাদি করে থাকে।অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতই রাজবংশী সমাজে মৃত ব্যক্তির চারপাশে আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গ বন্ধুবান্ধব ঘিরে থাকে। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। পরিস্কার সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে। মৃতব্যক্তিকে তিন চার ঘন্টা রাখা হয় বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের শেষ দেখা হওয়ার জন্য। মৃত ব্যক্তির পুত্র জল ছিটিয়ে দেয় এবং মুখাগ্নি করে। বাঁশের মাচা তৈরি করে ভাল করে বেঁধে চারজন মানুষের (পুত্র, নিকট আত্মীয়) কাঁধে চাপিয়ে নদীর ঘাটে অথবা নিকটবর্তী শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দাহ করা হয়। তের দিন নির্দিষ্ট আচারের মাধ্যমে শোকপালনের পর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়।

রাজবংশী সমাজ ছোটছোট কৃষক পরিবারে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবারে একজন করে বয়স্ক ব্যক্তি বাবা, মা, সন্তানাদি নিয়ে এক-একটি পরিবার। বিধবা বোন ও পিসিমাও

থাকে। কৃষক পরিবারে প্রায় প্রত্যেকেই কাজে সাহায্য করে থাকে। রাজবংশীরা খুবই অতিথি-বৎসল। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকে। খুব বড় যৌথ পরিবারও থাকে। বনিবনার অভাব হলে বড় পরিবার ছোটছোট পরিবারে বিভক্ত হয়। কখনও বৃদ্ধ পিতা মাতারও একটি সংসার হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় সংসারে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জীবন-কালে পরিবারের বাঁধন অটুট থাকে। কখনও বা বিবাহিত পুত্র সংসার থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোন জায়গায় চলে যায় কাজের সন্ধানে। এবং কর্মস্থলেই পাকাপাকি ভাবে থেকে যায়। ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হলেও প্রত্যেকেরই একতা থাকে। বিপদে-আপদে অথবা আনন্দানুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং একাত্মভাবে অংশগ্রহণ করে। সম্প্রতি শিক্ষার প্রসারে রাজবংশীরা বাইরে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছে। কলকারখানা, এবং নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, স্বাভাবিক কারণেই ।

রাজবংশী লোকগীতির পটভূমি এবং এই সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়, তা হল 'ধর্ম'। রাজবংশী সমাজ ধর্মে খুব বিশ্বাসী। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আদিম সমাজের সঙ্গে খুব সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। এরা আদিম সমাজের মত প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতিকে নানা ভাবে পূজা করবার প্রয়াস যা কিনা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। ডাইনী এবং ভূত প্রেতেও এরা খুব বিশ্বাসী। হুদুমদ্যাও পূজা অর্থাৎ বৃষ্টি কামনায় প্রকৃতির পূজা, বিষহরি পূজা করে সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ফসলের জন্যও পূজা হয় - তিস্তাবুড়ি পূজা, মেচেনীখেলা পূজা। এই পূজাগুলোর ধরণধারণ আলাদা। মেয়েরা দল বেঁধে গান করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে এবং পূজা করে। এছাড়া রাজবংশীরা সাইটোল পূজা, সুবচনী পূজা, শিবকালী ও ভান্ডানীর পূজা করে। পূজা সম্পর্কে আর একটি বৈশিষ্ট হল - পূজাপার্বন সম্পূর্ণরূপে স্ত্র-আচারের মধ্যে পড়ে এবং তা মেয়েদের একান্তভাবে নিজস্ব। পুরুষের কোন স্থান এতে নেই। এক বিশেষ ঢঙে, বিশেষ পদ্ধতিতে

এই পূজাগুলি হয়। পূজাতে গান একটি মুখ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশেষত: পূজা পার্বনের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে রাজবংশী সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মেয়েরা। রাজবংশী লোকসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে রাজবংশী পূজা পার্বনের গান। সমীক্ষায় দেখা গেছে এই গান মেয়েরাই মুখে মুখে রচনা করেছে। সুতরাং লোক-সঙ্গীতে অনেকাংশেই নারীর অবদান রয়েছে।

রাজবংশীরা ভূত প্রেতকে বলে 'দ্যাও'। জটিল রোগের আভাস দেখলে এরা বলত 'দ্যাও' ধইরছে'। জ্বর অথবা পেটখারাপ হলে বলা হত - বাতাস লেগেছে অথবা 'দ্যাও' ধরেছে। পুরনো সমাজের মানুষের মন্ত্রশক্তিতেও রাজবংশীদের বিশ্বাস ছিল। সাম্প্রতিক কালেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অসুখে-বিসুখে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ওঝার কাছে প্রথমে যায় এবং ঝাড়ফুঁক করে। মন্ত্র-এর একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

হাড়ি ঘর চান্নি বাতি
কুমার ঘর ডেহারী
তাহাতে জড়িয়া দিনু
শ শ বাতি
তোর ভোগা নড়ে গাংও
তোর ভোগা চড়ে
তোর বাপ ডাক পারে
সনার চাইলন বাতি
নে হাতে করিয়া
চলো যাই শিবের কৈলাশ নাগিয়া।

অপর একটি মন্ত্র -

হরে কিষোনো নায় পারোয়ার নায়
আনধার ঘর ফিরাছে তোক
জর জারি ছারিয়া পারোয়ার নায়
সপোস হাতে নামো কালী, মনচে দিয়া পাঁও
উপীর অষ্টাং দেহা ছারিয়া পারোয়ার
শিগ্‌গির ক নায়।

রাজবংশী সমাজে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত, তা হল - সামান্য কারণেই এরা দেবতার উদ্দেশ্যে মানত বা শপথ করে, অনেক সময় বলি দেওয়ারও শপথ গ্রহণ করে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও বয়স্কা মহিলা অথবা বৃদ্ধা থাকে তারা অনেকে মন্ত্র জানে এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল। জ্বর, কাশি, সর্দি ইত্যাদি অসুখে গ্রামের রাজবংশী মানুষ এদের কাছেই যায়। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার প্রসারে মানুষের অন্ধ-সংস্কার খানিকটা দূরীভূত হয়েছে, মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞান-মনস্ক হয়েছে। রাজবংশী সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটছে।

সূত্রনির্দেশ

১। ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহারের ইতিহাস, অণিমা প্রকাশনী, ১৮৮২, পৃ.৩১

২। Charu Chandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, The Asiatic Society, Calcutta, 1965, p.1.

৩। Census of India, 1971, series 22, West Bengal part-II A General Population Tables.
- Series 22 West Bengal, part V-A, Special Tables on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Series 22, West Bengal, part II C(II) Social and Cultural Tables.

৪। Rajat Subhra Mukhopadhyay, The Rajbansis of North Bengal : A comparative Demographic profile, Department of Sociology and Social Anthropology, University of North Bengal, p.11.

৫। Sunity Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, The Asiatic Society, 1974, p.112.

৬। নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকগীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ.১

৭। Sir George Abraham Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.I, part-I pp.153.

৮। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গের লোক-সঙ্গীত : ভাওয়াইয়া ও চটকা, গ্রন্থমন্দির প্রকাশন, ১৯৯২, পৃ.২১

৯। প্রাগুক্ত, পৃ.৬

১০। প্রাগুক্ত, পৃ.৩২